International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-V, September 2024, Page No.56-71
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i5.2024.56-71

বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ সরকার ও সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বঃ একটি পর্যালোচনা

অজয় বর
গবেষক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
On December 16, 1971, East Pakistan emerged as an independent sovereign Bangladesh state on the world map, proving the futility of the two-nation theory through the liberation war. People of both Hindu and Muslim communities participated unitedly in the establishment of Bangladesh. As the first Bangladesh government, led by Sheikh Mujibur Rahman, adopted democratic, socialist, and secular ideals, the minority communities sought to ensure their proportional representation in national politics. But since the birth of Bangladesh, radical Islamic groups have been trying to turn Bangladesh into an Islamic state. They know that the religious minorities of Bangladesh are one of the vital forces of democratic politics. After the assassination of Sheikh Mujibur Rahman in 1975, fundamentalists became active again in Bangladeshi politics, and minority representation in national politics was skewed. As a result, fear spreads among minority's fear of persecution, and fear of eviction. Their fear or apprehension was turned into reality by the later military rulers of Bangladesh. However after a long period of military rule, when the Awami League government was formed under the leadership of Sheikh Hasina in 1996, the power of religious minorities increased in the national politics of Bangladesh. Subsequently, from 2008 to August 5, 2024, Sheikh Hasina ruled Bangladesh, but the proportional representation of minorities in national politics did not increase. In my discussion, the first Awami League government led by Sheikh Mujibar in independent Bangladesh and later the Awami League government led by Sheikh Hasina in the political arena of Bangladesh, i.e., in the national elections and the cabinet, besides analyzing the representation of religious minorities, try to discuss how religious minorities became a protected political vote bank of the Awami League.

Keywords: Democracy, Socialist, Secularism, Proportional Representation, Politics, Religious Minorities.

১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করেছিল। গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রি, অসাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ ভিত্তিক স্বাধীন

বাংলাদেশের চলার পথটি ছিল অমসৃণ। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট একদল আততায়ী কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মূল ভাবাদর্শ থেকে বিচ্যুত করার পাশাপাশি গণতন্ত্রকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করেছিল। মুজিবুর রহমানের হত্যার পরবর্তীকালে বাংলাদেশে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক চেতনা ও ভাবাদর্শ রাষ্ট্রনীতিকে গ্রাস করেছিল। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সামরিক শাসনের আবহক্রমে পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক আবহ ও সাম্প্রদায়িক নীতির উপস্থিতি নানাভাবে পরিলক্ষিত হয়।

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে নির্বাচন ও সাম্প্রদায়িকতা সমার্থক হয়ে গেছে। এই নির্বাচনের সাথে যদি যুক্ত হয় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন, তাহলে তাতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। সাম্প্রদায়িকতা আরো প্রজ্বলিত হয়। নির্বাচন এলেই তাই বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা উদ্দীপ্ত হয় না, বরঞ্চ শংকিত হয়ে পড়ে। তাদের উপর নেমে আসে অত্যাচার, নিপীড়ন, অমর্যাদা, অপমান। তার মূল কারণ হলো নির্বাচনের সময় সংখ্যালঘুদের প্রয়োজন হয় নির্বাচন প্রার্থীর, যাদের অধিকাংশই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের-বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যেখানেই তাদের অবস্থান হোক না কেন। তাছাড়া জনসংখ্যা অনুপাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব নেই জাতীয় সংসদে। কোন রাজনৈতিক দলই তাদের মনোনয়ন প্রদান করে না সেই বিবেচনায়। অবশ্য দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক কোনো সংস্থাতেই সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নেই।[১] আমি মূলত আমার গবেষণা জাতীয় সংসদের নির্বাচনের উপরেই সীমিত রাখবো। কারণ জাতীয় সংসদ দেশের সার্বভৌমত্বের ধারক, সকল আইনের উৎস ও সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু জাতীয় সংসদ নির্বাচিত করেন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে। তাই জাতীয় সংসদে যদি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব না থাকে, তাহলে কোনভাবেই সেই সংসদ তাদের জন্যে নির্ভরশীল স্বার্থ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না।

শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ সরকার ও সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব (১৯৭৩): স্বাধীন বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশন ১৯৭৩ সালের ৩১শে জানুয়ারী প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এবং নির্বাচনের দিনক্ষণ নির্ধারিত হয় ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ।[৪২] ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ নির্বাচনে ১৬ টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনের জন্য পতিক লাভ করলেও ১৪ টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। এই ১৪ টি রাজনৈতিক দলের ১০৮৯ জন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ১২০ জন অর্থাৎ মোট ১২০৯ জন প্রার্থী প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। এই ১২০৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থী ছিল ৫৩ জন যা ৪.৩৮ শতাংশ মাত্র। প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৪টি রাজনৈতিক দলের মোট ১০৮৯ জন প্রার্থীর মধ্যে হিন্দুধর্মাবলম্বী প্রার্থী ছিলেন ৩৯ জন (৩.৫৮%), বৌদ্ধধর্মাবলম্বী প্রার্থী ছিলেন ০৫ জন (০.৪৮%) এবং খ্রিস্টানধর্মাবলম্বী ছিলেন ০২ জন (.০২০%) প্রার্থী।[২] সংখ্যানুপাতিক হারে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের মনোনয়ন প্রদানের অবমূল্যায়নের চিত্রটি স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বকেও অবমূল্যায়িত করে। জেলাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাগুলিতে অধিক সংখ্যায় সংখ্যালঘুদের মনোনয়ন দিয়েছিল। আওয়ামী লীগের ১৩ জন সংখ্যালঘু সদস্যের মধ্যে শুধুমাত্র হিন্দু অধ্যুষিত খুলনা, ফরিদপুর, যশোর ও বাকেরগঞ্জেই মোট ১১ জন হিন্দু সংখ্যালঘু প্রার্থীর মধ্যে ০৮ জনকে মনোনয়ন দিয়েছিল।[৩]

১৯৭৩ সালে ৭ই মার্চ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ৯৬ হাজার ১৭৭টি। যার মধ্যে বৈধ ভোটার সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৯৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৬৮০টি এবং সংখ্যালঘু ভোটারদের ৫৭.০৫ শতাংশ ভোটার ভোটদান করেছিল।[৪] এই নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৩টি আসন পেয়েছিল আওয়ামী লীগ। এছাড়া জাসদ ০১টি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ ০১টি এবং স্বতন্ত্ররা ০৫টি আসনে জয়লাভ করেছিল। সংরক্ষিত ১৫টি মহিলা আসনেও আওয়ামী লীগ জয়লাভ করেছিল। প্রথম নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভাবনীয় সাফল্য পরিলক্ষিত হলেও ৩১৫ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে মাত্র ১৪ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন যা মোট সংসদ সদস্যের ৪.৪৪ শতাংশ মাত্র।[৫]

বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যালঘু সদস্যগণ (সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ- ১৯৭৩):

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	আসন	রাজনৈতিক দল
১	কানাইলাল সরদার	রংপুর-১৫	আওয়ামী লীগ
২	পীযূষ ভট্টাচার্য	যশোর-৭	আওয়ামী লীগ
৩	কুবের চন্দ্র বিশ্বাস	খুলনা-৫	আওয়ামী লীগ
৪	হরনাথ বাইন	বাকেরগঞ্জ-১২	আওয়ামী লীগ
৫	চিত্তরঞ্জন সুতার	বাকেরগঞ্জ-১৪	আওয়ামী লীগ
৬	ক্ষিতীশ চন্দ্র মন্ডল	বাকেরগঞ্জ-১৫	আওয়ামী লীগ
৭	সন্তোষ কুমার বিশ্বাস	ফরিদপুর-১২	আওয়ামী লীগ
৮	ফনিভূষণ মজুমদার	ফরিদপুর-১৯	আওয়ামী লীগ
৯	মনোরঞ্জন ধর	ময়মনসিংহ-২৭	আওয়ামী লীগ
১০	মানিক চৌধুরী	সিলেট-১৮	আওয়ামী লীগ
১১	মানবেন্দ্র নারায়ণ	পার্বত্য চট্টগ্রাম	স্বতন্ত্র
১২	চাই তোয়াই রাজা	পার্বত্য চট্টগ্রাম	স্বতন্ত্র
১৩	কনিকা বিশ্বাস	সংরক্ষিত মহিলা আসন	আওয়ামী লীগ
১৪	সুদীপ্তা দেওয়ান	সংরক্ষিত মহিলা আসন	আওয়ামী লীগ

(সূত্র: Bangladesh Election Commission: Statistical Report of National Election of Bangladesh, 1973, Dacca, Bangladesh Election Commission, p.p.115-120)

আওয়ামী লীগের মনোনীত ১৩ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু প্রার্থীর মধ্যে ১২ জন জয় লাভ করেছিল। এদের মধ্যে দুজন কণিকা বিশ্বাস এবং সুদীপ্তা দেওয়ান সংরক্ষিত মহিলা আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলন। ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯.৫৭ শতাংশ ছিল ধর্মীয় সংখ্যালঘু। ১৯৬২-১৯৭৩ পর্যন্ত কোন আদমশুমারি না হওয়ায় এই সংখানুপাতে ৩১৫ জন সদস্যবিশিষ্ট সংসদে ৬২ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সদস্য থাকার পরিবর্তে মাত্র ১৪ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছিল। সেই সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল সাফল্যের পর ২৩ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন এবং ৩রা অক্টোবর ১৪জন প্রতিমন্ত্রী তার মন্ত্রিসভায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। মুজিবর রহমানের ৩৭ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভায় মাত্র ০৩ জন ছিলেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। এই তিনজন

মন্ত্রীর মধ্যে দুজন ফনিভূষণ মজুমদার খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ এবং ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় ও মনোরঞ্জন ধর আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পূর্ণমন্ত্রী পদে নিযুক্ত ছিলেন। এবং ক্ষিতীশ চন্দ্র মন্ডল একমাত্র প্রতিমন্ত্রী ছিলেন যিনি কৃষি সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছিলেন।[৬] স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রীসভাতেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের সংকট ছিল ব্যাপকহারে।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ গঠনের পর শেখ মুজিবুর রহমান নানান বলিষ্ঠ জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও ১৯৭৩ সালের ১৬ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম মন্ত্রিসভা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেই সাথে ১৯৭৪ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বাংলাদেশকে গ্রাস করেছিল। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের সঙ্গে মোজাফফর আহমেদের ম্যাপ এবং মনির সিংহের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল। এই তিন দলীয় জোট বাংলাদেশের একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেছিল। এই চিন্তা ভাবনার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে এবং দ্বিতীয় বিপ্লবের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে ২৮শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ ব্যাপী জরুরী ব্যবস্থা জারি করা হয়েছিল এবং ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাস করে ১১৭ (ক) অনুচ্ছেদের দ্বারা একমাত্র জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' (বাকশাল) গঠন করেন ও 'একদলীয় শাসন ব্যবস্থা' প্রবর্তন করেছিলেন মুজিবুর রহমান। কিন্তু ১৯৭৫ সালে ১৫ ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানসহ পরিবারের ১৬ জন সদস্য একদল সেনা সদস্যের হাতে নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাকশাল সরকারের পতন ঘটেছিল। যার ফল স্বরূপ বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের দ্রুত পরিবর্তনশীলতা পরিলক্ষিত হয়েছিল যা বাংলাদেশে পুনরায় সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার সংকটকে সুতীব্র করেছিল।

শেখ হাসিনার আমলে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ সরকার ও সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব (১৯৯৬): ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা এবং কারাগারে বন্দি চার জাতীয় নেতাকেও হত্যার মধ্য দিয়ে ১৯৭২ সালের স্বাধীন বাংলাদেশের মূলমন্ত্র গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা আবার মুখ থুবড়ে পড়ে। এবং খন্দকার মোশতাক ও সেনা প্রধান জিয়াউর রহমান চক্র স্বাধীন বাংলাদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে সামরিক শাসন ও স্বৈরতন্ত্রের ধারা। পরবর্তীকাল সেনাশাসক এরশাদের আমলেও একই ধারা অব্যাহত থাকে। অবৈধ সামরিক শাসকরা সংবিধান লঙ্ঘন, জনগণের ভোটাধিকার হরণ এবং নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে। এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মের অপব্যবহার, কালো টাকা, পেশি শক্তি, দুর্নীতি, লুটপাট ও দুর্বৃত্তায়নকে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিতে পরিণত করে। নব্বইয়ের গণঅভুত্থানের পর ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও বিএনপি স্বৈরশাসনের এ ধারাই অব্যাহত রাখে। যা পঁচাত্তর পরবর্তী সামরিক ও স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠী স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার সকল সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেয়।

খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের অবসানের পর ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ৮১টি রাজনৈতিক দলের ২২৯০ জন প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র ২৮৪ জন প্রার্থীসহ মোট ২৫৭৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। যেখানে ১৮টি রাজনৈতিক দল মাত্র ৪৯ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘুকে মনোনয়ন দিয়েছিল। এই ৪৯ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মধ্যে ৩৯ জন হিন্দু, ০৮ জন বৌদ্ধ ও ০২ জন খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিল এবং স্বতন্ত্র ২৮৪ জনের মধ্যে ১৮ জন (১২ জন হিন্দু, ও ০৬

জন বৌদ্ধ প্রার্থী) ছিলেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু। অর্থাৎ ২৫৭৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৬৭ জন যা মোট প্রার্থীর মাত্র ২.৬০ শতাংশ।[৭] সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সবচেয়ে বেশি ১৪ জনকে মনোনয়ন দিয়েছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। এই ১৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ১০ জন হিন্দু ধর্মাবলম্বী ০৩ জন বৌদ্ধ এবং ০১ জন খ্রিস্টানধর্মাবলম্বী প্রার্থী ছিলেন। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বি.এন.পি'র সংখ্যালঘু প্রার্থীর সংখ্যা পূর্ববর্তী ১৯৯১ নির্বাচনের থেকে ০২ জন বৃদ্ধি পেয়ে মোট ০৬ জন সংখ্যালঘু সদস্যকে বি.এন.পি মনোনয়ন দিয়েছিল। এছাড়া বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ০৫ জন সংখ্যালঘু হিন্দু ধর্মাবলম্বীকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয়। ১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশ হিন্দু লীগ যশোর-৫ আসনে শিশির কুমার বিশ্বাস এবং মাদারীপুর-৩ আসনে খোকন মুন্সিকে মনোনয়ন দিয়েছিল। এছাড়া সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন (স্বপন) বাগেরহাট-১ আসনে স্বপন কুমার মন্ডলকে ও সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন (সুধীর) ঢাকা-৩ আসনে সুধীর কুমার হাজরাকে মনোনয়ন দিয়েছিল। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি বাগেরহাট-৩ আসনে ড্যানিয়েল বিশ্বাস, জাকের পার্টি নড়াইল-২ আসনে শুভাশিস বাগচীকে মনোনয়ন দিয়েছিল।[৮]

১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী সমগ্র বাংলাদেশের ৩০০টি নির্বাচন কেন্দ্রের মধ্যে মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশের অধিক সংখ্যালঘু জনসংখ্যা বিশিষ্ট নির্বাচন কেন্দ্র ছিল ২৬টি এর মধ্যে ২৩টি হিন্দু অধ্যুষিত, ০৩টি নির্বাচন কেন্দ্র ছিল বৌদ্ধ অধ্যুষিত। এই ২৩টি হিন্দু অধ্যুষিত নির্বাচন কেন্দ্রের মধ্যে ২১টি তে আওয়ামী লীগের বিপুল জয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি নির্বাচন কেন্দ্রেও বিপুল জয় আওয়ামী লীগের প্রতি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অকণ্ঠ সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল। এই নির্বাচনে বিএনপি ০১টি ও জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ ০১টি হিন্দু অধ্যুষিত নির্বাচন কেন্দ্রে জয়লাভ করেছিল। এই নির্বাচনে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সব রাজনৈতিক দলগুলি পরাজিত হয়েছিল। এমনকি বাংলাদেশ হিন্দু লীগ ও বাংলাদেশ সিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।[৯] সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেননি। নির্বাচনী ফলাফলের দেখা যায় আওয়ামী লীগ প্রদত্ত ভোটের ৩৭.৪৪ শতাংশ ভোট পেয়ে সর্বাধিক ১৪৬ টি আসনে জয়লাভ করে। বি.এন.পি প্রদত্ত ভোটের ৩৩.৬০ শতাংশ ভোট পেয়ে ১১৬ টি আসন লাভ করে। জাতীয় পার্টি প্রদত্ত ভোটের ১৬.৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে ৩২ টি আসন লাভ করে। এই নির্বাচনে ইসলামী মৌলবাদী দলের ফলাফল ছিল আশাতীতভাবে নিম্নগামী। মাত্র ০৩টি আসলে তারা জয় লাভ করে। যদিও প্রাপ্ত ভোটের জামায়াতে ইসলামের শতকরা হওয়ার ছিল ৮.৬১ শতাংশ। এছাড়া এই নির্বাচনে জাসদ(রব), ইসলামে ঐক্য জোট এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রত্যেকে ০১টি করে আসনে জয়লাভ করে।[১০]

বাংলাদেশ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যালঘু সদস্যগণ (সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ-১৯৯৬):

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত সদস্যের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র	রাজনৈতিন দল
১	সতীশচন্দ্র রায়	দিনাজপুর-২	আওয়ামী লীগ
২	বীরেন শিকদার	মাগুড়া-২	আওয়ামী লীগ
৩	ধীরেন্দ্রনাথ সাহা	নড়াইল-১	আওয়ামী লীগ
৪	ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু	বরগুনা-১	আওয়ামী লীগ

৫	পঞ্চানন বিশ্বাস	খুলনা-১	,, (উপনির্বাচনে বিজয়ী)
৬	নারায়ন চন্দ্র চন্দ	খুলনা-৫	,, (উপনির্বাচনে বিজয়ী)
৭	সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত	হবিগঞ্জ-২	,, (উপনির্বাচনে বিজয়ী)
৮	রমেশচন্দ্র সেন	ঠাকুরগাঁও-১	,, (উপনির্বাচনে বিজয়ী)
৯	কল্পরঞ্জন চাকমা	পার্বত্য খাগড়াছড়ি	আওয়ামী লীগ
১০	বীর বাহাদুর	পার্বত্য বান্দাবরন	আওয়ামী লীগ
১১	দীপংকর তালুকার	পার্বত্য রাঙ্গামাটি	আওয়ামী লীগ
১২	গৌতম চক্রবর্তী	টাঙ্গাইল-৬	বিএনপি
১৩	ভারতী নন্দী (সরকার)	সংরক্ষিত মহিলা সংসদ	আওয়ামী লীগ
১৪	চিত্রা ভট্টাচার্য	সংরক্ষিত মহিলা সংসদ	আওয়ামী লীগ
১৫	এথিন রাখাইন	সংরক্ষিত মহিলা সংসদ	আওয়ামী লীগ

(সূত্রঃ Bangladesh Election Commission: Statistical Report, 7th Jatiyo Shangshad Election, 1996, Dhaka, Bangladesh Election Commission, পৃ.পৃ. ৩৭-৬৭।)

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ১২ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সদস্য প্রত্যক্ষভাবে ও ০৩ জন মহিলা সদস্য নির্বাচিত দলীয় সংসদের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলনে। অবশ্য আওয়ামী লীগ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে তিনজন সংখ্যালঘু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়ে মহিলাদের প্রতি সুবিচার করে। এই তিনজনের মধ্যে একজন ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। মোট নির্বাচিত সাংসদ সদস্যের মধ্যে ৪.৫৪ শতাংশ ছিল ধর্মীয় সংখ্যালঘু যা ১৯৯১ সালের তুলনায় ০.৯১ শতাংশ সদস্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খুলনা-১ থেকে পঞ্চানন বিশ্বাস, খুলনা-৫ থেকে নারায়ন চন্দ্র চন্দ, হবিগঞ্জ-২ থেকে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এবং ঠাকুরগাঁও-১ থেকে রমেশ চন্দ্র সেন উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৪৬ টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছাকাছি থাকলেও প্রকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারায় রাজনৈতিক অচল অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিল। এমতাবস্থায় জাতীয় পার্টির সমর্থনে ১৯৯৬ সালে ২৩শে জুন শেখ হাসিনা ২২ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ দীর্ঘ ২১ বছর পর ক্ষমতায় আবার ফিরে আসে এবং শেখ হাসিনা ছিলেন বাংলাদেশের দশম প্রধানমন্ত্রী এবং দ্বিতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী। তাঁর এই মন্ত্রিসভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে কল্পরঞ্জন চাকমাকে পূর্ণমন্ত্রী ও সতীশ চন্দ্র রায়কে মৎস্য ও পশু সম্পদ বিষয়ক দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল।[১১]

১৯৯৬-এর জুনের নির্বাচনের পরে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর যে নির্যাতন হয়েছিল বিশেষভাবে বি.এন.পি ও তার সহযোগী সন্ত্রাসীদের দ্বারা, উল্লেখযোগ্য দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করে অনেক দিন। সরকার গঠনের পর মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই মূল আলোচনা হয় সন্ত্রাস নিয়ে। অথচ, সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে কোন কথা হয়নি। অসাম্প্রদায়িক, মৌলবাদমুক্ত, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল বলে দাবিদার যে আওয়ামী লীগ ২১ বছর পর পুনরায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে তাদের এই নিরবতা ছিল, কি শুধু রাজনৈতিক কৌশল? সেজন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মিলিত দাবি, জাতীয় সংসদের সেই আইন পাস করা

হোক যাতে আগামী দিনের নির্বাচনে তাদের অংশগ্রহণ করতে না হয়।[১২] তাদের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছিল সংকটপূর্ণ।

বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে শেখ হাসিনার দ্বিতীয়বার ক্ষমতা দখল ও সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব (২০০৮): অষ্টম জাতীয় সংসদে কার্যকাল অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন চারদলীয় ঐক্যজোট সরকারের কার্যকাল শেষ হয়েছিল ২০০৬ সালের ২৭শে অক্টোবর। সংবিধান মোতাবেক সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কে. এম. হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পথ গ্রহণে অস্বীকার করলে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ নিজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। বিএনপি মনোনীত ও জাতীয়তাবাদী আদর্শে প্রভাবিত ইয়াজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় সেনাবাহিনী এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে পদচ্যুত করে। সেনাবাহিনী সরাসরি ক্ষমতা গ্রহণ না করে তাদের মনোনীত ডক্টর ফখরুদ্দীন আহমেদকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন। সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দু'বছর ক্ষমতা থেকে নির্বাচিত সরকার, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অষ্টম সংসদ এবং নবম সংসদের মাঝখানে দু'বছর একটা শূন্যতা রয়েছে এটাও বাংলাদেশের সংসদের ইতিহাসের নতুন নয়। কারণ আমার আলোচনায় আগেও দেখিয়েছি বাংলাদেশের গণতন্ত্রের প্রতীক যে বাংলাদেশের সংসদ তার ধারাবাহিকতা বারবার কিভাবে বিঘ্নিত ঘটেছে।[১৩] সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠনের ফলশ্রুতি হিসেবে ২০০৭ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি এ.টি.এম শামসুল হুদা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। অবশেষে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে নির্বাচন কমিশন বহুকাঙ্খিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ২০০৮ সালে ২৯ ডিসেম্বর দিনটি ধার্য করেছিল। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩৮ টি রাজনৈতিক দলের ১৪১৬ জন প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র ১৫১ জন প্রার্থী সহ মোট ১৫৬৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জাসদ, ওয়ার্কাস পার্টি সম্মিলিতভাবে ১৪ দলীয় মহাজোট গঠন করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। অন্যদিকে বিএনপি নেতৃত্ব দিয়েছিল জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি এবং এল.ডি.পি সম্মিলিতভাবে চার দলীয় ঐক্যজোটের।[১৪]

সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ এককভাবে ২৬৪টি আসনে, জাতীয় পার্টি ৪৯ টি আসনে, জাসদ ০৭ টি আসনে, ওয়াকার্স পার্টি ০৫ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। অন্যদিকে বিএনপি ২৬০ টি আসনে, জামাতে ইসলামী ৩৯ টি আসনে, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ০২ টি এবং এল.ডি.পি ১৮ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩৮ টি রাজনৈতিক দলের মোট ১৪১৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪৯ জন ছিলেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু। এই ৪৯ জনের ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মধ্যে ৩৮ জন ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী, ১০ জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও ০১ জন ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। এছাড়া স্বতন্ত্র ১৫১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১২ জন (০৮ জন হিন্দু ও ০৪ জন বৌদ্ধ) ছিলেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু অর্থাৎ মোট ১৫৬৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৬১ জন। যা মোট পার্থের ৩.৮৯ শতাংশ মাত্র।[১৫] যদিও আওয়ামী লীগ ২০০১ সালের মতো ২০০৮ সালের নির্বাচনে ১৫ জন সংখ্যালঘুকে মনোনয়ন দেয়, যার মধ্যে ১১ জন ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী, তিনজন বৌদ্ধ ও একজন খ্রিস্টান। ২০০১ সালের তুলনায় বিএনপির সংখ্যালঘু প্রার্থী দুজন বৃদ্ধি পেয়েছিল যার মধ্যে ঢাকা-৩ আসনে গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ও খাগড়াছড়িতে সমীরণ

দেওয়ানকে মনোনয়ন দেয়ার পাশাপাশি রাঙ্গামাটিতে মনি স্বপন দেওয়ানের পরিবর্তে মৈত্রী চাকমাকে মনোনয়ন দিয়েছিল। এছাড়া বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির মনোনীত সংখ্যালঘু প্রার্থীর সংখ্যা একজন হ্রাস পেয়েছিল বিগত নির্বাচনের তুলনায়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিকল্পধারা বাংলাদেশ কুড়িগ্রাম-২ আসলে ভূদেব চক্রবর্তীকে, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল গাইবান্ধা-১ আসনে বীরেন চন্দ্র শীলকে এবং গণফোরাম ফরিদপুর-৩ আসনে স্বপন কুমার গাঙ্গুলিকে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছিল। এই নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ হিন্দু লীগ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিন্দু পার্টি, সিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের মত কোন সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি।[১৬] যার ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিজস্ব রাজনৈতিক দলের কোনো অস্তিত্ব থাকলো না এই নির্বাচনে, যা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে একটি রাজনৈতিক সংকট স্বরূপ হিসেবে দেখা দেয়।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুসারে ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় বাংলাদেশের মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৮,১০,৫৮,৬৯৮ জন। এই নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ৭,০৬,৪৮,৪৮৫ টি এবং প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার ৮৭.১৩ শতাংশ যা ছিল বাংলাদেশের নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোটদান। এই নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগে নেতৃত্বাধীন মহাজোট ২৬২ টি আসনের বিজয়ী হয়েছিল। আওয়ামী লীগ একাই ২৩০ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ৪৮.০৮ শতাংশ), জাতীয় পার্টি ২৭ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ৭.০৮ শতাংশ), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ০৩টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ০.৭২ শতাংশ) এবং ওয়ার্কাস পার্টি ০২ টি আসনে(প্রদত্ত ভোটের ০.৩৭ শতাংশ) বিজয়ী হয়েছিল। অন্যদিকে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট ৩৩টি আসন পেয়েছিল যার মধ্যে বিএনপি একাই ৩০ টি আসন(প্রদত্ত ভোটের ৩২.৫০ শতাংশ), জামায়াতে ইসলামী ০২টি আসন (প্রদত্ত ভোটের ৮.৭০ শতাংশ), বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ০১ টি (প্রদত্ত ভোটের ০.২৫ শতাংশ), এল.ডি.পি. ০১ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ০.২৭ শতাংশ) জয়লাভ করেছিল। এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিজয়ী হয়েছিলেন ০৪ টি আসনে যাদের প্রদত্ত ভোট ছিল ২.৯৮ শতাংশ।[১৭]

বাংলাদেশ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যালঘু সদস্যগণ (সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ-২০০৮):

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত সদস্যের নাম	নির্বাচনক্ষেত্র	রাজনৈতিক দল
১	রমেশচন্দ্র সেন	ঠাকুরগাঁও-১	আওয়ামী লীগ
২	মনোরঞ্জন শীল গোপাল	দিনাজপুর-১	আওয়ামী লীগ
৩	সাধন চন্দ্র মজুমদার	নওগাঁ-১	আওয়ামী লীগ
৪	রনজিত কুমার রায়	যশোর-৪	আওয়ামী লীগ
৫	বীরেন শিকদার	মাগুরা-২	আওয়ামী লীগ
৬	ননী গোপাল মন্ডল	খুলনা-১	আওয়ামী লীগ
৭	নারায়ণচন্দ্র চন্দ	খুলনা-৫	আওয়ামী লীগ
৮	ধীরেন দেবনাথ শম্ভু	বরগুনা-১	আওয়ামী লীগ
৯	প্রমোদ মানকিন	ময়মনসিংহ	আওয়ামী লীগ
১০	সুকুমার রঞ্জন ঘোষ	মুন্সীগঞ্জ-১	আওয়ামী লীগ
১১	সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত	সুনামগঞ্জ-২	আওয়ামী লীগ
১২	যতীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা	পার্বত্য খাগড়াছড়ি	আওয়ামী লীগ

১৩	দীপংকর তালুকদার	পার্বত্য রাঙ্গামাটি	আওয়ামী লীগ
১৪	বীর বাহাদুর	পার্বত্য বান্দারবন	আওয়ামী লীগ
১৫	অপু উকিল	সংরক্ষিত মহিলা আসন	আওয়ামী লীগ
১৬	সাধনা হালদার	সংরক্ষিত মহিলা আসন	আওয়ামী লীগ
১৭	এথিন রাখাইন	সংরক্ষিত মহিলা আসন	আওয়ামী লীগ

সূত্রঃ পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮, ঢাকা, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, পৃ.পৃ. ৯৮-১০৮।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৪ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সদস্য প্রত্যক্ষভাবে ও ০৩ জন মহিলা সদস্য সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত দলীয় সংসদের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। অবশ্য আওয়ামী লীগ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে তিনজন সংখ্যালঘু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়ে মহিলাদের প্রতি সুবিচার করে। এই তিনজনের মধ্যে একজন ছিলেন রাখাইন উপজাতির এথিন রাখাইন। তিনি সপ্তম সংসদেও আওয়ামী লীগের মনোনীত মহিলা সংসদ ছিলেন। নবম সংসদে আওয়ামী লীগ মনোনীত অন্য দুই ধর্মীয় সংখ্যালঘু মহিলা সংসদ হলেন সাধনা হালদার এবং অপু উকিল। এই তিন মহিলা সংসদকে নিয়ে ৩৪৫ আসন বিশিষ্ট নবম সংসদের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সংসদ সংখ্যা ছিল ১৭ জন যা মোট নির্বাচিত সাংসদ সদস্যের মধ্যে ৪.৬৩ শতাংশ ছিল ধর্মীয় সংখ্যালঘু।[১৮]

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট ২৬২টি আসনে জয়লাভ করে জাতীয় সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় রাষ্ট্রপতি রিয়াজউদ্দিন আহমেদ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে সরকার গঠনে অনুরোধ জানালে সংসদনেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে ৬ই জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ৩৬ সদস্যবিশিষ্ট্য মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন। এই মন্ত্রিসভা গঠনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ দু বছরের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রাজত্বকালের অবসানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক শাসনতন্ত্রের পুনর্জন্ম হয়েছিল। শেখ হাসিনা তার দ্বিতীয় মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু সদস্য হিসেবে রমেশ চন্দ্র সেনকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরূপে, দীপঙ্কর তালুকদারকে চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিমন্ত্রীর রূপে এবং দিলীপ বড়ুয়াকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পূর্ণমন্ত্রী রূপে নিযুক্ত করেছিলেন। দিলীপ বড়ুয়া বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রথম সংখ্যালঘু মন্ত্রী, যিনি সংসদ সদস্য ছিলেন না। তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় ঐক্যজোটভুক্ত সাম্যবাদী দলের নেতা। পরবর্তীকালে ২০০৯ সালে ৩১শে জুলাই মন্ত্রিসভার সম্প্রচারিত করে শেখ হাসিনা সংখ্যালঘু সংসদ প্রমোদ মানকিনকে সংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় প্রতিমন্ত্রী রূপে নিযুক্ত করেন। এছাড়া ২০১১ সালের জুন মাসে সুনামগঞ্জের সাংসদ সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে পূর্ণমন্ত্রীরূপে রেলমন্ত্রণালয় দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর দুর্নীতি সংক্রান্ত বিতর্কে জড়িয়ে পড়লে তাকে রেল মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে দপ্তরবিহীন মন্ত্রী করা হয়েছিল। শেখ হাসিনা তাঁর দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা কার্যকালে একসাথে পাঁচ জন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সদস্যের মন্ত্রিপরিষদে স্থান পাওয়া বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসের সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন রাজনৈতিক-বিশ্লেষকরা।[১৯] এর আগে কোন সরকারের শাসনামলে মন্ত্রিসভায় হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানদের একসাথে দেখা যায়নি, যা শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মন্ত্রিসভায় দেখা গিয়েছিল। এর ফলে

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী জাতীয় রাজনীতিতে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল।

বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে শেখ হাসিনার তৃতীয়বার ক্ষামতা দখল ও সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব (২০১৪): গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৩ (৩)(ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে ২৭শে অক্টোবর ২০১৩ সাল হতে ২৪শে জানুয়ারি ২০১৪ সালের মধ্যে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করা ছিল সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। সেই মতানুসারে বাংলাদেশের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনের ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের প্রথা বাতিল হয়ে যায় এবং নির্বাচিত সরকারের অধীন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিধান প্রণীত হয়। সেইমতো তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হওয়ার পর নির্বাচিত সরকারের অধীন অনুষ্ঠিত প্রথম এ নির্বাচনে দেশবাসীর মধ্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি এবং আন্তর্জাতিক মহলেও ছিল ব্যাপক আগ্রহ।[২০] কিন্তু নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নির্বাচনের দাবিতে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি ও জামায়েত ইসলামীসহ ১৮ দলীয় ঐক্য জোট দশম সংসদ নির্বাচন বর্জন করে। যার ফলস্বরুপ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলীয় জোট, জাতীয় পার্টি (এরশাদ), জাতীয় পার্টি (মঞ্জু), তরিকত ফেডারেশন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ফেডারেশন সহ অন্যান্য নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মাত্র ১২টি রাজনৈতিক দল দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এই দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বে ছিলেন কাজী রকিবউদ্দিন আহমেদ। নির্বাচনের দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০১৩ সালের ২৫ শে নভেম্বর তিনি নির্বাচনের তারিখ এবং সিডিউল ঘোষণা করেন। নির্বাচন কমিশনের আদেশ অনুসারে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন দাখিলের শেষ তারিখ ২০১৩ সালের ২রা ডিসেম্বর এবং প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ছিল ১৩ই ডিসেম্বর ২০১৩। এই নির্বাচনে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের পরে দেখা যায় ৩০০টি নির্বাচন কেন্দ্রের মধ্যে ১৫৩টি নির্বাচনী কেন্দ্রে সংসদ সদস্যগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে গেছেন, যার মধ্যে আওয়ামী লীগেরই রয়েছে ১২৭ জন। যে নির্বাচনে দেশের অর্ধেকের বেশি ভোটার তাদের পছন্দমতো কোন প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে না, তা গণতন্ত্রের জন্যে শুধু দুর্ভাগ্যজনক নয়, বিপদজ্জনকও। যা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে একটি কলঙ্কিত অধ্যায় সূচিত করে(৮২)।[২১] এবং দেশের বাকি ১৪৭ টি নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় ৫ই জানুয়ারি ২০১৪ সালে। সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ এককভাবে ২৪৭টি আসনে, জাতীয় পার্টি ৮৬ টি আসনে, জাসদ ২৪ টি আসনে, ওয়াকার্স পার্টি ১৮ টি আসনে, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন ০৩টি আসনে, জাতীয় পার্টি (জেপি) ২৮টি আসনে, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বি.এন.এফ) ২২টি আসনে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১০৪ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এই দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১২টি রাজনৈতিক দলের মোট ৪৪২ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৬ জন ছিলেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু। এবং ২৬ জনের ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মধ্যে ২১ জন ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী, ০৪ জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও ০১ জন ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। এছাড়া স্বতন্ত্র ১০১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১ জন (০৭ জন হিন্দু ও ০৪ জন বৌদ্ধ) ছিলেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু অর্থাৎ মোট ৫৪৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৭ জন। যা মোট প্রার্থীর ৬.৮১ শতাংশ মাত্র। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনায় দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থী ২৪ জন হ্রাস পেয়েছিল। যদিও আওয়ামী লীগ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৭ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল যা নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চেয়ে দুজন বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর আগে কোন সংসদ নির্বাচনে

আওয়ামী লীগ এত বেশি সংখ্যক সংখ্যালঘু প্রার্থীকে নির্বাচনে মনোনয়ন দেননি। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও বাংলাদেশ হিন্দু লীগ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিন্দু পার্টি, সিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের মত কোন সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি।[২২] যার ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিজস্ব রাজনৈতিক দলের কোনো অস্তিত্ব থাকলো না এই নির্বাচনে, যা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হিসেবে দেখা দেয়।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক ভাবে ২৩৪ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ৪৮.০৮ শতাংশ) বিজয়ী হয়েছিল, জাতীয় পার্টি ৩৪ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ৭ শতাংশ), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ০৫ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ১.১৯ শতাংশ), ওয়ার্কার্স পার্টি ০৬ টি আসনে(প্রদত্ত ভোটের ২.১০ শতাংশ), বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন ০২ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ১.০৪ শতাংশ), জাতীয় পার্টির (জে.পি) ০২ টি আসনে(প্রদত্ত ভোটের ০.৭৩ শতাংশ) এবং বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট মাত্র ০১ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ০.৬৩ শতাংশ) বিজয়ী হয়েছিল। এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিজয়ী হয়েছিলেন ১৬ টি আসনে যাদের প্রদত্ত ভোট ছিল ১৫.০৬ শতাংশ।[২৩]

বাংলাদেশ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যালঘু সদস্যগণ (সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ-২০১৪):

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত সদস্যের নাম	নির্বাচনক্ষেত্র	রাজনৈতিক দল
১	রমেশচন্দ্র সেন	ঠাকুরগাঁও-১	আওয়ামী লীগ
২	মনোরঞ্জন শীল গোপাল	দিনাজপুর-১	আওয়ামী লীগ
৩	সাধন চন্দ্র মজুমদার	নওগাঁ-১	আওয়ামী লীগ
৪	রনজিত কুমার রায়	যশোর-৪	আওয়ামী লীগ
৫	স্বপন ভট্টাচার্য্য	যশোর-৫	স্বতন্ত্র
৬	বীরেন শিকদার	মাগুরা-২	আওয়ামী লীগ
৭	পঞ্চানন বিশ্বাস	খুলনা-১	আওয়ামী লীগ
৮	নারায়ণ চন্দ্র চন্দ	খুলনা-৫	আওয়ামী লীগ
৯	ধীরেন দেবনাথ শম্ভু	বরগুনা-১	আওয়ামী লীগ
১০	পংকজ নাথ	বরিশাল-৪	আওয়ামী লীগ
১১	প্রমোদ মানকিন	ময়মনসিংহ	আওয়ামী লীগ
১২	সুকুমার রঞ্জন ঘোষ	মুন্সীগঞ্জ-১	আওয়ামী লীগ
১৩	মৃণাল কান্তি দাস	মুন্সীগঞ্জ-৩	আওয়ামী লীগ
১৪	জয়া সেনগুপ্ত	সুনামগঞ্জ-২	আওয়ামী লীগ
১৫	কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা	পার্বত্য খাগড়াছড়ি	আওয়ামী লীগ
১৬	ঊষাতন তালুকদার	পার্বত্য রাঙ্গামাটি	স্বতন্ত্র
১৭	বীর বাহাদুর উশৈ সিং	পার্বত্য বান্দারবন	আওয়ামী লীগ
১৮	হেপী বড়াল	সংরক্ষিত মহিলা সাংসদ	আওয়ামী লীগ

সূত্রঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৪, ঢাকা, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, পৃ.পৃ. ৬০-৮০।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৭ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সদস্য প্রত্যক্ষভাবে ও ০১ জন মহিলা সদস্য সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত দলীয় সংসদের নির্বাচনে দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনজন মহিলা সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত হলেও দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অবশ্য আওয়ামী লীগ মাত্র একজন সংরক্ষিত মহিলা সংখ্যালঘু প্রার্থী হেপী বড়ালকে মনোনয়ন দিয়ে ছিল। এই ১৭ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীর মধ্যে ১৫ জন আওয়ামী লীগের মনোনয়নে জয় লাভ করে এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে যশোর-৫ থেকে স্বপন ভট্টাচার্য এবং রাঙ্গামাটি নির্বাচন কেন্দ্র থেকে উষাতন তালুকদার বিজয়ী হয়েছিলেন দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলাদের আসন ৪৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ করা হয়েছিল। ফলে এই এক জন মহিলা সংসদকে নিয়ে ৩৫০ আসন বিশিষ্ট দশম সংসদের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সংসদ সংখ্যা ছিল ১৮ জন যা মোট নির্বাচিত সাংসদ সদস্যের মধ্যে ৫.১৪ শতাংশ ছিল ধর্মীয় সংখ্যালঘু।[২৪]

দশম সংসদ গঠন প্রক্রিয়ার শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ নবনির্বাচিত ১৪ দলীয় জোটের সংসদীয় দলনেত্রী শেখ হাসিনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন সরকার গঠনে আমন্ত্রণ জানান। শেখ হাসিনা সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এক অভিনব সরকার গঠন করেন যাকে তিনি বলেছিলেন ঐক্যমত্যের সরকার। যে সরকারে অংশ নিয়েছেন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব রাজনৈতিক দল। দশম সংসদ নির্বাচনের পর শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রীত্বে গঠিত ৪৯ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিপরিষদে, ২৯ জন মন্ত্রী ১৭ জন প্রতিমন্ত্রী এবং ২ জন উপমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেছিলেন। ২৯ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মধ্যে একজন সংখ্যালঘুও স্থান পায়নি, তবে অবশ্য ৪ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘুকে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে তাঁর মন্ত্রীপরিষদের স্থান দিয়েছিলেন। যে চারজন ধর্মীয় সংখ্যালঘুকে প্রতিমন্ত্রী দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাদের সাধারণত কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, যেমন বীর বাহাদুরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, নারায়ণ চন্দ্রকে মৎস্য প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়, বীরেন শিকদারকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং প্রমোদ মানকিনকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিমন্ত্রী করা হয়। নবম সংসদের নির্বাচনে বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধুকন্যা যে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার পথ প্রশস্থ করে দিয়েছিলেন, দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সংখ্যালঘুদের উপর সেই আস্থা যে রাখতে পারেননি, তা তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সংখ্যালঘুদের অবস্থান দেখলে বোঝা যায়। প্রতিটা নির্বাচনের মত দশম সংসদ নির্বাচনেও সংখ্যালঘুরা আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিল এবং তার জন্য তাদের অনেক কঠিন মূল্যও পরিশোধ করতে হয়েছে। যাই হোক বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের জন্য নির্বাচনের অর্থই হলো শুধুই হারানোর কিছুই পাওয়ার নয়।[২৫]

বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে শেখ হাসিনার চতুর্থবার ক্ষামতা দখল ও সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব (২০১৮):
বাংলাদেশে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৩০ শে ডিসেম্বর ২০১৮ সালে। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ন্যায় এই নির্বাচনেও নির্বাচিত সরকারের অধীন নির্বাচন কমিশনারের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বাংলাদেশের বৃহৎ দুটি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন 'মহাজোট'ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বি.এন.পি) নেতৃত্বে গঠিত 'জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট' জোটসহ সর্বমোট ৩৯ দলের ১৭২০ জন ও স্বতন্ত্র ১২৮ জন প্রার্থী সহ মোট ১৮৪৮ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এই নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মোট ৭৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন যা মোট সদস্যের ৪.২৭ শতাংশ মাত্র। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংখ্যালঘু সদস্যদের মনোনয়নের দিক থেকে এককভাবে সবচেয়ে বেশি ১৮ জন সংখ্যালঘু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল

আওয়ামী লীগ। তবে এই নির্বাচনের সামগ্রিকভাবে সংখ্যালঘু প্রার্থী বেশি মনোনয়ন দিয়েছিল বামপন্থী দলগুলি। যেমন সি.পি.বি মনোনয়ন দিয়েছিল ১৭ জনকে জাসদ ৯ জনকে, বিপ্লবী ওয়াকার্স পার্টি ০৭ জনকে। এছাড়া গণফোরাম ০৩ জন, বি.এন.এফ ০৩ জন, ন্যাপ ০২ জন এবং গণতন্ত্র পার্টি ০১ জন সংখ্যালঘু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল। অন্যদিকে এবারের নির্বাচনে বি.এন.পি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ০৬ জনকে, জাতীয় পার্টি তিনজন ইসলামিক দল হিসেবে পরিচিত জাকের পার্টি ০১ জনকে মনোনয়ন দিয়েছিল এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ০২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এককভাবে ২৫৭ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ৭৪.৬৩ শতাংশ) বিজয়ী হয়েছিল, জাতীয় পার্টি ২৩ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ৫.২২ শতাংশ), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ৭ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ১৩.০৬ শতাংশ), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ০২ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ০.৭২ শতাংশ), ওয়ার্কাস পার্টি ০৪ টি আসনে(প্রদত্ত ভোটের.০.৭৬ শতাংশ), বিকল্পধারা বাংলাদেশ ও গণফোরাম ২ টি করে আসনে, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন ০১ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ০.৫১ শতাংশ), জাতীয় পার্টির (মঞ্জু) ০১ টি আসনে(প্রদত্ত ভোটে ০.২১ শতাংশ) এবং বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল মাত্র ০১ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ০.৩৩ শতাংশ) বিজয়ী হয়েছিল। এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী হয়েছিলেন ০২ টি আসনে যাদের প্রদত্ত ভোট ছিল ০.৯৬ শতাংশ।[২৬]

বাংলাদেশ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যালঘু সদস্যগণ (সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ-২০১৮):

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত সদস্যের নাম	নির্বাচনক্ষেত্র	রাজনৈতিক দল
১	রমেশচন্দ্র সেন	ঠাকুরগাঁও-১	আওয়ামী লীগ
২	মনোরঞ্জন শীল গোপাল	দিনাজপুর-১	আওয়ামী লীগ
৩	সাধন চন্দ্র মজুমদার	নওগাঁ-১	আওয়ামী লীগ
৪	রনজিত কুমার রায়	যশোর-৪	আওয়ামী লীগ
৫	স্বপন ভট্টাচার্য্য	যশোর-৫	আওয়ামী লীগ
৬	বীরেন শিকদার	মাগুরা-২	আওয়ামী লীগ
৭	পঞ্চানন বিশ্বাস	খুলনা-১	আওয়ামী লীগ
৮	নারায়ণ চন্দ্র চন্দ	খুলনা-৫	আওয়ামী লীগ
৯	ধীরেন দেবনাথ শম্ভু	বরগুনা-১	আওয়ামী লীগ
১০	পংকজ নাথ	বরিশাল-৪	আওয়ামী লীগ
১১	মানু মজুমদার	নেত্রকোণা-১	আওয়ামী লীগ
১২	অসীম কুমার উকিল	নেত্রকোণা-৩	আওয়ামী লীগ
১৩	মৃণাল কান্তি দাস	মুন্সীগঞ্জ-৩	আওয়ামী লীগ
১৪	জয়া সেনগুপ্ত	সুনামগঞ্জ-২	আওয়ামী লীগ
১৫	জুয়েল আরেং	ময়মনসিংহ	আওয়ামী লীগ
১৬	কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা	পার্বত্য খাগড়াছড়ি	আওয়ামী লীগ
১৭	ঊষাতন তালুকদার	পার্বত্য রাঙ্গামাটি	আওয়ামী লীগ
১৮	বীর বাহাদুর উশৈ সিং	পার্বত্য বান্দারবন	আওয়ামী লীগ

১৯	বাসন্তী চাকমা	সংরক্ষিত মহিলা আসন	আওয়ামী লীগ
২০	অরমা দত্ত	সংরক্ষিত মহিলা আসন	আওয়ামী লীগ
২১	গ্লোরিয়া ঝর্না সরকার	সংরক্ষিত মহিলা আসন	আওয়ামী লীগ

সূত্রঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৮, ঢাকা, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৮ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সদস্য প্রত্যক্ষভাবে ও ০৩ জন মহিলা সদস্য সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত দলীয় সংসদের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। অবশ্য আওয়ামী লীগ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে তিনজন সংখ্যালঘু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়ে মহিলাদের প্রতি সুবিচার করে। এই তিনজনের মধ্যে একজন ছিলেন চাকমা উপজাতির বাসন্তী চাকমা। একাদশ সংসদে আওয়ামী লীগ মনোনীত অন্য দুই ধর্মীয় সংখ্যালঘু মহিলা সংসদ হলেন অরমা দত্ত এবং গ্লোরিয়া ঝর্না সরকার। এই তিন মহিলা সংসদকে নিয়ে ৩৫০ আসন বিশিষ্ট একাদশ সংসদের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সংসদ সংখ্যা ছিল ২১ জন যা মোট নির্বাচিত সাংসদ সদস্যের মধ্যে ৬ শতাংশ ছিল ধর্মীয় সংখ্যালঘু।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন 'মহাজোট' ৩৩৮ টি আসনে (৫০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ) জয়লাভ করে জাতীয় সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেত্রী শেখ হাসিনা ২০১৯ সালের ৭ই জানুয়ারি টানা তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ৪৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। যেখানে ২৫ জন পূর্ণমন্ত্রী ১৯ জন প্রতিমন্ত্রী এবং ৩ জন উপমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর এই মন্ত্রীসভায় মাত্র ৩ জন সংখ্যালঘু সদস্য মন্ত্রীত্ব পেয়েছিলেন। যাঁদের মধ্যে সাধন চন্দ্র মজুমদার 'খাদ্য মন্ত্রণালয়', বীর বাহাদুর উশৈ সিং 'পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের' পূর্ণমন্ত্রী হয়েছিলেন। এবং স্বপন ভট্টাচার্য্য 'স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের' একমাত্র প্রতিমন্ত্রী হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে শেখ হাসিনার পঞ্চমবার ক্ষমতা দখল ও সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব (২০২৪): একাদশ জাতীয় সংসদে কার্যকাল শেষ হওয়ার পর ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দলীয় সরকারের অধীনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বিএনপির সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এই নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করায় নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে সমালোচিত হয় দেশ-বিদেশ। এই নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ ভাবে ২২৪ টি আসনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। এই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে মাত্র ১৪ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এছাড়া দুইজন মহিলা সংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন। যা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যালঘু সদস্যদের থেকে ৫ জন সদস্য হ্রাস পেয়েছিল। ২০২৪ সালের ১০ই জানুয়ারি টানা চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার ৪৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। তাঁর এই মন্ত্রিসভায় মাত্র চারজন সংখ্যার সদস্য মন্ত্রিত্ব পেয়েছিলেন।

বাংলাদেশ চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ২০২৪ সালের অগাস্ট মাসের ছাত্র-জনতার অসহযোগ আন্দোলনের কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ ই আগস্ট ত্যাগ করলে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে। এবং বাংলাদেশে পুনরায় সেনা সমর্থনে গঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

সামগ্রিক পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিশেষে বলা যে, শেখ মুজিবর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতার লাভ করে এবং আওয়ামী লীগ প্রথম সরকার গঠন করেন। যেহেতু মুজিবরের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার দেশ স্বাধীন করে সেহেতু এই সরকারের প্রতি সমস্ত জনগণের ন্যায় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সমর্থন ছিল প্রথম থেকে। এবং এই ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হয়। কিন্তু এই সরকারের আমলে জাতীয় রাজনীতিতে সংখ্যানুপাতিক সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব দেখা যায়নি। পরবর্তীকালে মুজিব কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিন বাংলাদেশে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। শেখ হাসিনার এই শাসনকালে জাতীয় রাজনীতিতে সংখ্যালঘু সদস্য উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেলেও সংখ্যানুপাতিক হারে বৃদ্ধি ঘটেনি। তবে ১৯৭৩ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সমস্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা রাজনৈতিকভাবে বলিষ্ঠ করেছে বারবার।

তথ্যসূত্রঃ

১. সিংহ, কঙ্কর, ২০১৫, ‘নির্বাচন সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব’, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ১৫।

২. Bangladesh Election Commission: Statistical Report of National Election of Bangladesh, 1973, Dacca, Bangladesh Election Commission, p.p. 20-21.

৩. তদেব, পৃ.পৃ. ৭৫-১১১।

৪. তদেব, পৃ.পৃ. ৯০-৯৫।

৫. Baxter, Craig, and M. Rashiduzzaman, April, 1981, 'Bangladesh Votes: 1978 and 1979', Asian Survey, Vol. 21, No. 4, p.p. 485-489.

৬. Bangladesh Election Commission: Statistical Report of National Election of Bangladesh, 1973, Dacca, Bangladesh Election Commission, p.p. 115-120.

৭. জাহান, এমরান ও খান, মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, ২০১৮, ’বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৭২-২০১৪’, অবসর, ঢাকা, পৃ.পৃ. ২৩৪-২৪১।

৮. Bangladesh Election Commission: Statistical Report, 7th Jatiyo Shangshad Election, 1996, Dhaka, Bangladesh Election Commission, পৃ.পৃ. ৮১-১৬১।

৯. শরীফ, আহমেদ, ২০১৭, ‘বাংলাদেশ নির্বাচন ও গণতন্ত্র’, অনন্যা, ঢাকা, পৃ. ১৬৫।

১০. Bangladesh Election Commission: Statistical Report, 7th Jatiyo Shangshad Election, 1996, Dhaka, Bangladesh Election Commission, পৃ.পৃ. ৩৭-৬৭।

১১. Bangladesh Election Commission: Statistical Report, 7th Jatiyo Shangshad Election, 1996, Dhaka, Bangladesh Election Commission, p.p. 3-9.

১২. কাওছার, এ.বি.এম রিয়াজুল কবির, ২০১৬, ‘বাংলাদেশ নির্বাচন, জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ (১৯৪৭-২০০৬)’, আগমনী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ.পৃ.৭৪৮-৭৫৫।

১৩. জাহান, এমরান, প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ২৭১-২৭৬।
১৪. সিংহ, কঙ্কর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।
১৫. শরীফ, আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ২২০-২২২।
১৬. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮, ঢাকা, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, পৃ.পৃ. ১৫১-৩০৯।
১৭. তদেব, পৃ.পৃ. ১৫১-৩০৯।
১৮. তদেব, পৃ.পৃ. ৩৬-৫৮।
১৯. তদেব, পৃ.পৃ. ৫৯-১০৮।
২০. সিংহ, কঙ্কর, প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ১৩৯-১৪০।
২১. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮, ঢাকা, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, পৃ.পৃ. ৩-৪।
২২. সিংহ, কঙ্কর, প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ১৫৭-১৫৮।
২৩. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮, ঢাকা, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, পৃ.পৃ. ৬০-৭৩।
২৪. তদেব, পৃ.পৃ. ৭-৮।
২৫. সিংহ, কঙ্কর, প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ১৫৯-১৬০।
২৬. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৮, ঢাকা, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।